ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে যে কয়েকজন মহিলা সাহিত্যিক আপন বৈশষ্ট্যে ও প্রতিভায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন রাধারাণী দেবী তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

'ভারবি' থেকে প্রকাশিত ''রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা'' সংকলন গ্রন্থের ভূমিকার প্রথম বাক্যটি নিম্নরূপ; এবং ভূমিকাটির রচয়িতা অধ্যাপক সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য্য:

''রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল মহিলা-কবির নাম রাধারাণী দেবী।''[১]

একথা অনস্বীকার্য যে রাধারাণী দেবী যখন সাহিত্য জগতে প্রবেশ করলেন তখন বাংলা সাহিত্য জগতে মহিলা কবি বা সাহিত্যিকের সংখ্যা কম ছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে সময় পুরুষ প্রতিভারই প্রাধান্য ছিল বেশী। অসংখ্য পুরুষ সাহিত্যিকদের দ্বারা বাংলা সাহিত্য নানাভাবে সমৃদ্ধ হলেও তুলনামূলকভাবে নারী-প্রতিভার স্বাক্ষর ও স্বল্পতা বিস্ময়করভাবে কম বলা যায়। সে যুগের প্রচলিত ধারা অনুযায়ী গৃহকোণে আবদ্ধা ও বহির্জগতের শিক্ষায় বঞ্চিতা নারীর মধ্যে শিক্ষা ও চেতনার তথাকথিত অপ্রতুলতা থাকায় নারীর

পক্ষে সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করা সহজে সম্ভব হয় নি। যদিও তাদের মধ্যে জ্ঞান ও প্রতিভার কোন অকুলান ছিলনা। এক্ষেত্রে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের নির্দিষ্ট গন্ডী ও অনিচ্ছা — বহুল পরিমাণে দায়ী। আসলে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ - এর মতো উল্লেখযোগ্য খ্যাতনামা সহিত্যকারেরা যখন উন্নত মূল্যবোধগুলি এদেশের সাহিত্যে তুলে ধরতে চাইলেন— তখন আমাদের দেশের সমাজটা ছিল অন্ধ কুসংস্কারের নাগপাশে জর্জরিত। সমাজের বন্ধ্যাদশা ঘোচাতে শুধু পুরুষের ভূমিকা নয়, নারী জাতির যে বিশেষ ভূমিকা আছে — এ কথা বাংলাসাহিত্যে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। নারীর বিভিন্ন রূপ ধরা পড়েছে আমাদের সাহিত্যে। কখনও সে জননী, কখনও সে জায়া, কখনও সে আবার কন্যারূপে নিজেকে মেলে ধরেছে। এ বড় বিস্ময়ের যে — সামাজিক বিবর্তনের মধ্যেও বারে বারে নারী হয়েছে লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা। পুরুষশাসিত সমাজে সামাজিক অনুশাসন আর শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের জাঁকজমকের তলায় গোটা নারী সমাজকে পদদলিত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বাংলা সাহিত্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এরই মধ্যে সেই সময়ের যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় লেখিকা সাহিত্য জগতে নিজ নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই সমাজের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ এবং তাঁরা নিজেদের নির্দিষ্ট শিক্ষা ও গন্ডীর মধ্যে পুরুষশাসিত প্রাতিষ্ঠানিক জীবন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রসঙ্গতঃ কবি আনন্দ বাগচীর এই বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

'রাধারাণীর জন্ম ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহারে। সহজাত কবি প্রতিভার অধিকারে যে সময় তিনি সারস্বতচর্চায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন তখন বাংলার রক্ষণশীল সমাজে, মধ্যবিত্ত ঘরাণায় অবগুণ্ঠন অনিবার্য ছিল। সে যুগে গল্প-উপন্যাসের নায়িকা ছিল কল্পনায় ধার করা, প্রেমের ঘটনাবহুল উপাখ্যান রোমান্সমাত্র। পথে-ঘাটে ঘোমটা-খসা নারীর দেখা পাওয়া সহজ ছিল না। অবশ্য পশ্চিমী শিক্ষা সংস্কৃতির হাওয়া লেগেছিল যে বিশেষ সমাজে, যে উঁচুতলার ধনী পরিবারে তাদের কথা আলাদা। সামাজিক, পারিবারিক এই পটভূমিতে রাধারাণী অশেষ ভাগ্যবতী এই জন্যে যে তিনি পেয়েছিলেন ঘরে বাইরে অকৃপণ স্বাধীনতা, পুরুষের দুর্লভ বন্ধুত্ব আর শিক্ষার অবাধ সুযোগ। এবং সেই সঙ্গে আজীবন সাহিত্যের আবহাওয়া ও সচ্ছলতা। এত সত্ত্বে ও অনেক বাধা তাকে নিজের হাতে ঠেলে সরাতে হয়েছে। এগোতে হয়েছে অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে।'[২]

মূলতঃ পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে শোক ও হতাশা থেকেই তাঁদের সাহিত্য সাধনা শুরু হয়। স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, অনুরূপা দেবী সে যুগের উল্লেখযোগ্য লেখিকা হলেও তাঁদের সাহিত্যসাধনাকে অতীত ইতিহাসের স্মৃতিচারণা ও ব্যক্তিগত জীবনের সীমিত

অভিজ্ঞতার মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছেন। কেননা সে যুগের রীতি অনুযায়ী তাঁদের সাহিত্যচর্চা নারী জীবনের সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনার ও ঘর-গৃহস্থালীর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সমাজ-অনুশাসনের বাইরে কোন ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নেওয়া বা চিন্তা করা তাঁদের স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। আধুনিক নারীর জীবন-সংগ্রাম, জটিলতা, সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা-বেদনার ও তদুপরি সামাজিক ও পারিবারিক অবক্ষয়ের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁদের বিচরণ করতে হয়নি। তাই তাঁদের সাহিত্য-সাধনা নারীর সুকোমল হৃদয়বৃত্তি ও ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত একথা অস্বীকার করা যায় না। একথা ঠিক যে কালের বিবর্তনে নারী আজ শুধু গৃহধর্মেই আবদ্ধ নয়, আধুনিক শিক্ষা ও চেতনার হাত ধরে সে পুরুষের মতো পুরুষের সঙ্গেই বহির্জগত ও কর্মজগতে প্রবেশ করেছে। জীবন ও কর্মক্ষেত্রে সে পুরুষের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের স্বধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করছে। কিন্তু কোন কোন সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা ও জটিলতার ক্ষেত্রে নারী আজও লড়াই করে চলেছে সম্পূর্ণ এককভাবেই এই লড়াইয়ে কেউ তার শরিক নয় এমন কি তার নিজের পরিবারের নারী-পুরুষেরাও।

'আসলে পুরুষ প্রধান এই সমাজে এক পক্ষের প্রতিরোধ, প্রতিবাদ বিহীনতা এবং ক্রমাগত মেনে নেবার মানসিকতা থেকে উদ্ভূত যে যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি — সেখানে 'মুক্তি' কথাটা অর্থহীন। সমাজ তাই নিষ্ঠুর অমানবিক, অকারণ, অর্থহীন হাজারো সংস্কার ও সামাজিক বিধানে নারীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

সমাজ বা পরিবারের কল্যাণার্থে একসময় কন্যা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে অথবা মাটিতে পুঁতে দেওয়া হত। বিয়েতে কন্যাপক্ষের পণ দেবার রীতি। আবার সেই পণের কারণেই প্রতিদিন কতশত বউ বলি হয়। সম্পত্তি নিয়ে যেখানে নারীর মূল্য বিবেচিত হয়, সেখানে এমনটাই বুঝি স্বাভাবিক। পোষাক ইত্যাদির আবর্তে নারীই ভিষণভাবে বাঁধা; যেমন ঘোমটা, বোরখা, শাঁখা, সিঁদুর, লোহা ইত্যাদি। 'সতী' কথাটার পুং প্রতিশব্দটাই নেই। অগত্যা নারীকেই সতী হতে হয়। তাই এই অতি আধুনিক যুগেও মেয়ে নয়, সতী হবার কারণেই রূপ কানোয়ার চিরবন্দিতা। বৈধব্য-যন্ত্রণা — তাও এই নারীর জন্যেই বরাদ্দ। (অবশ্য আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে স্ত্রীর মৃত্যুর পর বৈধব্য পালন করেছিলেন। কিন্তু এমন উদাহরণ তো বিরল।) বউ মরুক না মরুক ইচ্ছা করলেই (আইন থাকলেও!) কোন স্বামী একাধিক বিয়ে করতে পারে। সমাজ এটাকে স্খলন মনে করে না। পুরুষের প্রতি এক্ষেত্রে সমাজ বড়ই সহিষ্ণু। কিন্তু কোন বিবাহিতা নারী কি এই দুঃসাহস দেখাতে পারবেন? সমাজ "নারীর তাই স্খলন" কিছুতেই মেনে নেবে না। যুগ যুগ ধরে কত শত সাহিত্য, নাটক, গান, কবিতা, গল্প ইত্যাদি সমৃদ্ধ হয়েছে অবৈধ প্রেমকে ঘিরে। সেই অবৈধ প্রেমের অধিকারও শুধু পুরুষের। স্বামীর বা পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির অধিকার পুত্রের। তবে এসবের উপশমে "আইন" বলে একটা কথার প্রচলন আছে। সমাজ ও পুরুষ কিন্তু চূড়ান্ত ব্যঙ্গে প্রত্যাখান

করে সেই আইনকে। এখানে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি উল্লেখ্য:

"ধর্মভ্রষ্টা স্ত্রী বিষয় পাইবে না; ... কেবল অসতী বিষয় পাইবে না; কেন না, সে স্ত্রী! ইহা যদি ধর্মশাস্ত্র, তবে অধর্মশাস্ত্র কি? ইহা যদি আইন হয়, তবে বে আইন কি?"[২ক]

হোক না স্ত্রী, সে তো নারী। তাই তার ক্ষেত্রে অধর্মটাই ধর্ম, বেআইনটাই আইন। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সেই সত্যটাকে মেনে নিতে পারেন নি। তাই তাঁর প্রশ্নটির উত্তর নয়, প্রেক্ষিতে এটুকু বলা যায় — স্বভাবগত, অধিকারগত, সমাজগত বৈষম্য যতদিন না নির্মূল হচ্ছে — ততদিন, আত্মবিমুখ স্ত্রী বা নারীজাতির সহিষ্ণুতা এবং মৌনতা ভিন্ন গতি নেই। তাঁরা তো মনুষ্যপদবাচ্যই নন। তারা দলিত, আলাদা এক জাতি, আলাদা সমাজ, যে সমাজ পুরুষের মর্জির ওপর নির্ভরশীল।"[৩]

নিজের জীবন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আজ নারী অর্জন করেছে। যদিও রাষ্ট্র আজ তাকে কিছু আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ করে দিয়েছে। তবুও নারীর এই সংগ্রাম একক বা রাষ্ট্রীয় নয়। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন নারীর ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সংগ্রাম থেকেই এই সফলতা এসেছে। তাই অন্যান্য সুবিধার মত সাহিত্য জগতেও নারীর প্রতিষ্ঠা

বহু পরে ঘটেছিল।

মূলত পুরুষতান্ত্রিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব আপন সৃষ্টির ঔজ্জ্বল্যে সাহিত্য-রসিকের কাছে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন রাধারাণী দেবী তাঁদেরই অন্যতম। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মননশীলতা তাঁর সাহিত্যের অন্যতম আকর্ষণ। নারীসুলভ রচনাভঙ্গী দ্বারা সাহিত্য সাধনা শুরু হলেও আধুনিক মানসিকতায় সমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যের এক সুচারু সংযোজন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়:

> *'কিন্তু স্বীকার করতে বাধা নেই যে, রাধারাণী দেবীর সাহিত্য ও সমাজচিন্তার যে দীপ্তি এই শতকের দুইয়ের এবং তিনের দশক থেকে বাংলাসাহিত্যজগৎকে আলো করে রেখেছিল, তা বেশিরভাগ বাঙালী পাঠকই ভুলে যেতে বসেছিল।'*

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থাৎ আরো সহজ ও স্পষ্ট করে বললে বিশের দশকের প্রিয়ম্বদা দেবী, কামিনী রায়, মানকুমারী বা কুসুমকুমারী দাসের মত প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান মহিলা সাহিত্যিকদের রচনার যে ধারা সে সময় পাঠক সমাজে আদৃত ও প্রশংসিত হয়েছিল তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ধারার বা ভিন্ন গোত্রের সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত হন রাধারাণী দেবী। প্রচলিত রোমান্টিক বা শোকাচ্ছন্ন সম্বলিত কাব্যধারায় বা কাব্যবিষয়ে সহজ অনুগমন বা সীমাবদ্ধ

পরিবেশকে সাবলীলভাবে দূরে সরিয়ে রেখে অনায়াসে ও অনাড়ম্বর স্বাচ্ছন্দ্যে তিনি তাঁর সাহিত্য-রচনায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। তৎকালীন বঙ্গসমাজে, এমনকি নগরজীবনেও, নারী আজকের যুগের নারীর মত স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল ছিল না। সামাজিক অনুশাসনে তাঁর গৃহজীবন এমনকি ব্যক্তিগত জীবনও নিয়ন্ত্রিত ছিল। স্বাধীনভাবে নারীর কোন মতামত প্রকাশ বা কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা ছিল না। জন্মার্জিত সংস্কার, ধ্যানধারণার বশবর্তী, ঈশ্বরবিশ্বাসী ও সামাজিক আচারবিধি সর্ববিষয়ে তার আচরণ ছিল পুরুষকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও বিধিবদ্ধ।

এই সামাজিক ও অনুশাসনের মধ্যেই বালবিধবা রাধারাণী দত্ত মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তাঁর 'লীলাকমল' গ্রন্থ প্রকাশ করে নিজের ব্যতিক্রমী চরিত্রের পরিচয় দিলেন। অনায়াস স্পষ্টতায় ও সহজ স্বাভাবিকতায় একটি নারীহৃদয় জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদন করলো। তাঁর সমাজ সচেতন মানসিকতা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি বাংলা সাহিত্য-জগতকে আলোড়িত করল। কেবল কাব্য নয় — কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ-সমালোচনা, কিশোর পাঠ্য রচনা-সাহিত্যের নানা শাখায়, এমনকি সনেট রচনায়ও ছিল তাঁর অনায়াস বিচরণ। শুধু তাই নয় 'কলাকৈবল্যবাদ'-এ (Art for Art's Sake) আত্মসমর্পণ না করে মানব মনের বিশেষ করে নারী হৃদয়ের অন্তর্লীন জিজ্ঞাসা ও সমস্যার বিষয়টি আদৌ উপেক্ষিত না হয়ে বরং যথাযথ প্রাধান্যে তা পাঠকের

কাছে আকর্ষক হয়ে উঠেছে। একটি নারীহৃদয় দিয়ে নারীসমস্যা ও জটিলতার বিষয়টির সাহিত্যরূপ পাঠককে কৌতূহলী করে তুলেছে। তাঁর রচনা পাঠে পাঠক একই সঙ্গে উপভোগ করেছেন অনাবিল হাসি ও আনন্দের খোরাক। মননশীলতার সঙ্গে জ্ঞান-বুদ্ধির গভীর ব্যঞ্জনার সংমিশ্রণ, কৌতুক ও সংশয়ের যুগপৎ অনুভূতির যথাযথ প্রকাশকে সাহিত্যিকের সৃষ্টি ক্ষমতার অন্যতম কৃতিত্ব বলা যেতে পারে। বলা বাহুল্য রাধারাণী দেবী তথা অপরাজিতা দেবীর রচনায় তার ঘাটতি দেখা যায়নি কখনও। রাধারাণী দেবী অপরাজিতা ছদ্মনামে লিখেছেন। দীর্ঘ ষোল বছর তিনি এই নামে লিখতেন। সে সময় তাঁর এই রচনাগুলিকে অনেকেই শরৎচন্দ্রের রচনা বলে মনে করতেন। রাধারাণীর ভাষা ও ভঙ্গি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। এ ভাষার মধ্যে আছে জীবনের নির্মোহ ও নির্মম বর্ণনা, গভীর অন্তর্জ্বালা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও করুণ বেদনা। তাঁর মিতভাষিতা, বৈদগ্ধ্য, গভীর জীবনদৃষ্টি, যুক্তিবাদী মানসিকতা ও পরিচ্ছন্ন রসবোধ বাঙালী পাঠকের কাছে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি শুধু বাঙালী নারী নন, সমগ্র নারীসমাজেরই সংগ্রামের প্রতিনিধি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ না পেলেও স্বশিক্ষায় শিক্ষিত এই নারী — নারী-সচেতনতার মূর্ত প্রতীক। আজ দেশে দেশে নারীর স্বাধিকারের জন্য যে সংগ্রাম ও নারীমুক্তির কথা শোনা যায় ১০০ বছর আগে রাধারাণী তাঁর জীবন ও সাহিত্যের মাধ্যমে তার শুভ সূচনা করে গেছেন। বাঙালী নারীর জন্য রেখে গেছেন স্বাধিকার-অর্জনের সংগ্রামী মনোভাব

ও উত্তরাধিকার। স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরীর মত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ছিল তাঁর সাহিত্যিক অন্তরঙ্গতা। এই অন্তরঙ্গতা শুধু ব্যক্তিগত সখ্য নয়। সাহিত্যিক আলোচনা ও জীবন চর্চায় তাঁরা অভিনন্দিত করেছেন এই ব্যতিক্রমী নারী সত্তাকে।

দুঃখের বিষয় তাঁর মৃত্যুর পর মাত্র দশটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হবে। অথচ কি আশ্চর্য তাঁর একখানি পুস্তকও এখন বাজারের লভ্য নয়। বলতে দ্বিধা নেই, তাঁর কোন গ্রন্থই প্রাপ্য নয়; এ বেদনা ও লজ্জা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের বা সাহিত্যের গবেষকদের নয়; এ বেদনা উৎসাহী পাঠকদের এবং লজ্জা আমাদের সকলের। অতি সম্প্রতি (২০০২) কবিকন্যা অধ্যাপিকা নবনীতা দেবসেন সম্পাদিত "রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা" প্রকাশিত হয়েছে 'ভারবি' থেকে। সেই গ্রন্থের প্রাক-কথন অংশের সামান্য উদ্ধৃতি:

"ভারবি'র উৎসাহে ১৯৩৭-এর পরে, ২০০২ তে রাধারাণী দেবীর কবিতার বই আবার প্রকাশিত হচ্ছে।"...

"... ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৪-এর মধ্যে রাধারাণী দেবীর তিনটা ও অপরাজিতার চারটা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। "...

'সিঁথিমৌর' ও 'বনবিহগী' প্রকাশের প্রায় চল্লিশ বছর পরে

রাধারাণী দেবী তাঁর নিজের ব্যবহৃত কপিতে কিছু সংযোজন করেছিলেন।... 'মিলনের মন্ত্রমালা' তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ।... এই বইতে তাঁর সেই কাজটির পরিচয় নেই, শুধুই মৌলিক কবিতা আছে।...

রাধারাণী ও অপরাজিতা পৃথকভাবে সংকলিত হলেন।''...

সুতরাং রাধারাণী দেবী তথা অপরাজিতা দেবীর সাহিত্য কর্মের পুর্ণাঙ্গ আলোচনা ও মূল্যায়নের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাই বাংলা সাহিত্যের এই আপাত উপেক্ষিত দিকটির প্রতি সকলের দৃষ্টিপাতের জন্য এই বিনীত প্রয়াস।

গ্রন্থপঞ্জী: ভূমিকা

১. রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা — রাধারাণী দেবী (প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৪০৮)
২. সাহিত্যের নানারকম — আনন্দ বাগচী (প্রথম সং. ১৯৮৭)
৩. রাধারাণী দেবীর রচনাসংকলন ১ — রাধারাণী দেবী
৪. লৌকিক উন্যান: মানবী সংখ্যা — সম্পাদক: প্রেমেন্দ্র মজুমদার (শ্রাবণ ১৪০৬)
৫. বঙ্গ সাহিত্য অভিধান — হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
৬. সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান — সংযোজক খণ্ড
৭. আত্মস্মৃতি — সজনীকান্ত দাস (প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ: ১৩৮৪)
৮. শরৎচন্দ্র: মানুষ এবং শিল্প — রাধারাণী দেবী (আনন্দ পাবিলিশার্স — ১৯৭৬)
৯. রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত — জগদীশ ভট্টাচার্য
১০. জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র — ড. অজিত কুমার ঘোষ
১১. শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার — ড. অজিত কুমার ঘোষ
১২. শরৎচন্দ্র: দেশ কাল সাহিত্য — উজ্জ্বল কুমার মজুমদার
১৩. বঙ্কিমচন্দ্রের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ — অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
১৪. এ মণিহার — উজ্জ্বল কুমার মজুমদার

প্রসঙ্গসূত্র: ভূমিকা

১.	রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা (সম্পাদনা: নবনীতা দেবসেন)	পৃষ্ঠা ১
২.	সাহিত্যের নানারকম — আনন্দ বাগচী	৫৩
৩.	লৌকিক উদ্যান: মানবী সংখ্যা (আগস্ট ১৯৯৯)	৫০-৫১
৪.	অপরাজিতা রাধারাণী — যশোধারা বাগচী	২১
৫.	রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা: প্রাক-কথন: নবনীতা দেবসেন	৫-৬